বাপা ও বেন আয়োজিত
''জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলঃ আভ্যন্তরীণ করণীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতা'' বিষয়ক সম্মেলনে গৃহীত

প্রস্তাব

পটভূমি

পৃথিবীর যে সব দেশ জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে, বাংলাদেশ তার অন্যতম।

যে জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্থ হবে, সেই পরিবর্তন ডেকে আনার পেছনে বাংলাদেশের তেমন কোন ভূমিকা নেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সূচিত শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বিগত প্রায় আড়াইশ বছর যাবত শিল্পায়িত দেশসমূহ কর্তৃক ক্রমাগতভাবে উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাস (উবগ), ইংরাজীতে Greenhouse Gas (GHG), উদগীরণই পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। এই পুঞ্জিভূত উদগীরণে বাংলাদেশের অংশ প্রায় শূণ্যের কোঠায়।

বর্তমানে শিল্পায়িত দেশসমূহের পাশাপাশি দ্রুত শিল্পায়মান দেশসমূহের উবগ উদগীরণ জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাকে আরও প্রকট করেছে।

যদিও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উবগ উদগীরণের পরিমাণ হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার একটি প্রয়াস জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের আওতায় অগ্রসর হচ্ছে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে ইতিমধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উবগ ঘনত্ব এবং যেহেতু এই ঘনত্ব হ্রাস একটি সময় সাপেক্ষ বিষয়, এবং উবগ উদগীরণ হ্রাসের প্রচেষ্টা সত্বেও আগামী বেশ কিছুকাল ধরে এই ঘনত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে, সেহেতু কিছুটা পরিমাণ জলবায়ু পরিবর্তন আজ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ যেসব ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দুই ধরণের তৎপরতা সংঘটিত হচ্ছে। একটি হলো, উবগ উদগীরণের পরিমাণ ''হ্রাসকরণ'' (mitigation); আর দ্বিতীয় হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ''উপযোগীকরণ'' (adaptation)। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে, সেহেতু এই উভয় ইস্যুতেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের একটা বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে ।

যেহেতু বাংলাদেশ দ্বারা উদগীরিত উবগের পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প, এবং নিম্ন মাথাপিছু আয়ের কারণে এদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত তীব্র, সেহেতু বাংলাদেশের উপর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উবগ হ্রাসকরণের চাপ প্রবল নয়।

হ্রাসকরণের চাপের সম্মুখীন হয়ে শিল্পায়িত দেশসমূহ অনেক সময় বিভিন্ন কৌশল, ছল-চাতুরী, ও ফাঁকির আশ্রয় নেয় এবং সে উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে ব্যবহার করে।

বাংলাদেশের মতো যেসব উন্নয়নশীল দেশ জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তাদেরকে উপযোগীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি নীতিগতভাবে স্বীকৃত।

এযাবত জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুতে বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা মহলে উপযোগীকরণমূলক বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির দিকেই মনোযোগ বেশী নিবদ্ধ। কিন্তু কেবলমাত্র বৈদেশিক সাহায্য লাভের মাধ্যমেই বাংলাদেশের পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উপযোগীকরণের মতো কঠিন কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এজন্য যেটা প্রয়োজন তা হলো বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলের একটি সামগ্রীক পুণর্নিরীক্ষণ এবং আভ্যন্তরীণ নীতিমালার পুণর্বিন্যাস।

IPCC কর্তৃক পরিবেশিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অনুসিদ্ধান্তসমূহ সাধারণভাবে বিশ্ব-পরিধিতে প্রযোজ্য হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি ভেদে এইসব অনুসিদ্ধান্তের তারতম্য হতে পারে। সেজন্য জলবায়ু পরিবর্তনের আংগিকে বাংলাদেশের স্থানীয় পরিস্থিতি নিয়ে আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশ একাধিক ধারায় আক্রান্ত হবে। প্রথমতঃ, সমুদ্র পৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিমজ্জিত হবে এবং তার ফলে একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ বাস্তুহারা ও জীবিকাহারা হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়তঃ, সামুদ্রিক পানির লবণাক্ততা বাংলাদেশের আরো গভীরে প্রবেশ করে এদেশের বিস্তৃর্ণ এলাকাজুড়ে কৃষি ও জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ করবে। তৃতীয়তঃ, উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে একদিকে হিমালয়ের তুষাড়-প্রবাহ সমূহ গলে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশের নদ-নদী শীতকালে সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়ে পড়বে, অন্যদিকে গ্রীষ্ককালে বায়ুতে আর্দ্রতাবৃদ্ধির ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্লাবনের মাত্রা তীব্রতর হবে। চতুর্থতঃ, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, প্রভৃতি চরম আবহাওয়ামূলক ঘটনার (extreme weather events) সংখ্যা ও মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। পঞ্চমতঃ, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন রোগ, শোক, মহামারী, প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাবে। সব মিলিয়ে, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জনজীবনের বিপর্যয় ডেকে আনবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের এইসব বিভিন্ন ধারার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা একটা দুরূহ কাজ, এবং এই কাজ সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নীতিমালার বিভিন্ন দিকেরই সংশোধন ও সংযোজন প্রয়োজন।

এতকাল যাবত বাংলাদেশে নদ-নদীসমূহের প্রতি যে পন্থাটি অনুসরণ করা হয়েছে, সেটি হলো ''বেঁড়ীবাধ পন্থা'' বা ''অবরোধ-পন্থা'' (Cordon Approach)। এই পন্থার ফলে প্লাবনভূমিকে নদীখাত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, এবং তার ফলে একদিকে বণ্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে প্লাবনভূমি পলিমাটিভরণ ও নদীর স্বাভাবিক প্লাবনের অন্যান্য সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এবং সর্বোপরি জলাবদ্ধতার প্রসার ঘটেছে। নদ-নদীর প্রতি অনুসৃত অবরোধ পন্থা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবকে তীব্রতর করবে।

বাংলাদেশের বড় অংশটিই একটি বদ্বীপ, এবং ভূতাত্বিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য এই বদ্বীপের সবচেয়ে বড় বর্ম হলো হিমালয় প্রসূত নদ-নদী দ্বারা সংঘটিত পলিমাটিভরণ। বেঁড়ীবাঁধ বা অবরোধ পন্থা পলিমাটিভরণের এই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করে এই বর্মকে দুর্বল করে দেয়। বেঁড়ীবাধ পন্থা বর্ষাকালে প্লাবনভূমিতা বিস্তৃত পানি ধরে রাখার মাধ্যমে শীতকালে নদ-নদীর শুষ্কতার সমস্যা মোকাবেলার প্রচেষ্টাকেও বাধাগ্রস্থ করে। একই কারণে অবরোধ পন্থা জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্ট লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না।

''অবরোধ পন্থার'' বিভিন্ন কুফলের আলোকে গবেষকরা বাংলাদেশের জন্য নদ-নদীর প্রতি ''উন্মুক্ত পন্থা'' (Open Approach)-র প্রস্তাব করেছেন। এই পন্থা নদী খাত ও প্লাবনভূমির স্বাভাবিক সম্পর্ককে অটুট রাখে ও আরও প্রসারিত করে। এর ফলে পলিমাটিভরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখে। তদুপরি, উন্মুক্ত পন্থা প্লাবনভূমিতা বর্ষাকালে বিস্তৃত নদ-নদীর পানি ধরে রেখে শীতকালে নদ-নদীতে পানি প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টাকে সুগম করে। একই সাথে তা সামুদ্রিক লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

সব মিলিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির ম্যথে নদ-নদীর প্রতি অনুসৃত পন্থার পরিবর্তনই হলো বাংলাদেশস্র জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজ। এই পরিবর্তনের মাধ্যমেই জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্ট তিনটি মূল বিরূপ প্রভাব, যথা নিমজ্জন, বর্ধিত লবণাক্ততা, ও নদ-নদীর চরমভাবাপন্নতার, বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

জলবায়ু পরিবর্তনার হুমকী মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশকে নদ-নদীর প্রতি পন্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি আরও বহুবিধ তৎপরতায় নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো দেশের বন সম্পদের সংরক্ষণ ও দেশে বনায়নের পরিধি বৃদ্ধি। বনায়ন বাতাসের কার্বন হ্রাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা। বন রক্ষা ও বনের পরিধি বিস্তারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী উবগ উদগীরণ হ্রাসকরণের প্রচেষ্টাতেও অবদান রাখতে পারে।

বন রক্ষা ও বনের প্রসার বৃদ্ধি উবগ হ্রাসকরণের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের আলোকে বাংলাদেশের ''উপযোগীকরণের'' ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সাম্প্রতিক ''সিডর'' (SIDR) ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, এই ঘূর্ণিঝড়-সৃষ্ট জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরও বহুগুণ হতো যদি না উপকূলীয় সুন্দরবন সিডরের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষকে আচ্ছাদন যোগাতো। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আগামীতে সিডরের মতো ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও শক্তিমত্তা আরও বৃদ্ধি পাবে, সেহেতু উপকূলীয় বন রক্ষা ও প্রসার বাংলাদেশের জন্য একটি জরুরী কর্তব্য।

বন রক্ষা ও বনের পরিধি বিস্তার বাংলাদেশের বনাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের ন্যায়সংগত স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষনের জন্যও সহায়ক।

উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্ট চরম প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অভিঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য বন রক্ষা ও প্রসারের পাশাপাশি বাংলাদেশের আরও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৯৯১ সনের ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে আগাম সংকেত প্রদান, সম্ভাব্য আক্রান্ত মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে স্থানান্তর, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ কিছু অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু এসব অগ্রগতি যথেষ্ট নয়, এবং নিরাপদ আশ্রয় স্থলের সংখ্যা ও মানের বৃদ্ধিসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। উপকূলীয় এলাকার আবাসিক ধরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনাও প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশের কৃষি উতপাদন কি কি ধারায় এবং কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে তা নিয়ে ব্যাপক সমীক্ষা প্রয়োজন। এসব সমীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে বাংলাদেশে কৃষি ''উপযোগীকরণের'' একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

যেসব খাতের নীতিমালা জলবায়ু পরিবর্তনের আলোকে পুণর্নিরীক্ষিত ও পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে জ্বালানীখাত অন্যতম। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য আগামীতে বাংলাদেশকে তার বিদ্যুত উতপাদন ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে। এই সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বিভিন্ন নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে সৌরশক্তি ব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনা বিদ্যমান। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে স্বল্পমাপের গৃহস্থালী বিদ্যুত চাহিদা মেটাতে সৌরশক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিধিতে উবগ হ্রাসকরণের প্রক্রিয়ায় শামিল হতে পারে এবং ''স্বল্প কার্বন ব্যবহারকারী প্রবৃদ্ধির'' (low carbon growth) দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

টেলিফোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেমন বাংলাদেশের গ্রামের ও সাধারণ মানুষ একটা উল্লম্ফনের মাধ্যমে সতার টেলিফোনের (landphone) স্তর অতিক্রম করে সরাসরি বেতার, অথবা মোবাইল ফোনের স্তরে পৌঁচেছেন, তেমনি তারা সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অনবায়নযোগ্য জ্বালানীর স্তর অতিক্রম করে সরাসরি নবায়নযোগ্য জ্বালানীর স্তরে উপনীত হতে পারেন।

সৌরশক্তি ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উপযোগী হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের শিল্প বিকাশেও সহায়ক হতে পারে। স্বল্পমাপের সৌরবিদ্যুত ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যথা সুইচ, কেবল, ইত্যাদি এখন বাংলাদেশেই উতপাদিত হয়। সোলার প্যানেল তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত মানের বালুকণাও বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে লভ্য। সুতরাং, সরকারী নীতিমালা সঠিক হলে অচিরেই বাংলাদেশে সোলার প্যানেল উতপাদনও সম্ভব। সুতরাং, সৌরশক্তির ব্যবহার বাংলাদেশে পোষাক-শিল্পের মতো একটা নতুন শিল্পখাতের জন্ম দিতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও চিকিতসা খাতেরও ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতিমধ্যে যেসব রোগ ও মহামারীর বিস্তার ঘটার সম্ভাবনা, সেসবের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ও মোকাবেলার সক্ষমতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কি কি নতুন রোগ ও মহামারীর আবির্ভাব হতে পারে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও সমীক্ষার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

জনসংখ্যার বিশাল আকার ও উচ্চ ঘনত্ব বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকীকে ঘোরতর করেছে, কেননা কোটি কোটি মানুষ আক্রান্ত হবে। তদুপরি, জনসংখ্যার বিশাল আকার নিয়ত দেশের জল, জমি, ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি করছে, মানুষকে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে বাধ্য করছে, বনের পরিধি হ্রাস করছে, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মুখে বাংলাদেশকে আরও অসহায় করে দিচ্ছে।

বিগত সময়কালে জনসংখ্যা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছিল, যার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু এই হ্রাসকৃত হারও বাংলাদেশের জন্য অত্যাধিক, এবং আরও উদ্বেগের বিষয় যে, সাম্প্রতিককালে আত্ম-সন্তুষ্টি, অবহেলা, ভ্রান্ত-নীতি, এবং প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রচেষ্টার অভাবে জনসংখ্যা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে পড়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে অধোগতি দেখা দিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকী সফলভাবে মোকাবেলার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ ও জনসংখ্যার হ্রাস বাংলাদেশের একটি অত্যাবশ্যক করণীয়।

সাধারণভাবে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর সম্ভাব্য বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রসারিত করা আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

যদিও জলবায়ু পরিবর্তন একটি সাধারণ সমস্যা, তা সত্বেও দেশের দরিদ্র মানুষ এর দ্বারা বেশী আক্রান্ত হবে, যাদের এই পরিবর্তন মোকাবেলার সক্ষমতাও অনেক কম। সে কারণে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাবে, ও অসম বিতরণমূলক উন্নয়ন কৌশলের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জলবায়ু বৈষম্যের (climate apartheid)-র উদ্ভব ঘটতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকী মোকাবেলায় বাংলাদেশকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীরা, বিশেষত তাদের মধ্যে যারা পৃথিবীর উন্নত, শিল্পায়িত দেশসমূহে বসবাস করছেন, তারা সেসব দেশের জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে, সে বিষয়ে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত বিমূর্ত ধারণাটির পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট মুখোয়ায়ব সৃষ্টি করতে পারেন এবং তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুতে বাংলাদেশের স্বার্থ ও অবস্থান জোরের সাথে তুলে ধরতে পারেন।

দাবী ও করণীয়

আন্তর্জাতিক পর্যায়েঃ

উন্নত দেশসমূহকে উবগ উদগীরণ হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার লক্ষ্যে জরুরী ও জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাল-বাহানা ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধের বোঝা শেষ পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশসমূহের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা থেকে উন্নত দেশসমূহকে বিরত থাকতে হবে।

বাংলাদেশসহ অন্যান্য যেসব উন্নয়নশীল দেশ জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে তাদেরকে সর্বাত্মক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং বাংলাদেশকে অবশ্যই উপযোগীকরণের লক্ষ্যে প্রাপ্য তার ন্যায্য প্রাপ্য সহযোগীতা আদায় করতে হবে।

যেসব উন্নত শিল্পায়িত দেশের উবগ উদগীরণ জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র-পৃষ্ঠের উষ্ণতা ডেকে এনেছে, সেসব দেশে বাংলাদেশে নিমজ্জনের কারণে যে কোটি কোটি মানুষ বাস্তুহারা ও জীবিকাহারা হয়ে পড়বেন তাদের অভিবাসনের সুযোগ দিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য উপযোগীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রাপ্য যেসব সাহায্য তহবিল, তা বাংলাদেশের হাতে সরাসরি ন্যাস্ত করতে হবে।

বিশ্ব-পরিধিতে উপযোগীকরণ প্রয়াসের কেন্দ্র বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কেননা উপযোগীকরণের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকাই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব-পরিধিতে, বিশেষতঃ জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো কনভেনশনের (UNFCCC) আওতায় অগ্রসরমান প্রক্রিয়ায়, জলবায়ু পরিবর্তন রোধের দাবীতে বাংলাদেশকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুতে জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা ভুক্তভোগী অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ এবং উন্নত দেশসমূহের মধ্যে যারা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অধিকতর যুক্তিসংগত দৃষ্টিভংগী পোষণ করে, তাদের সাথে বিভিন্ন জোটবদ্ধ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে উদ্যোগী হতে হবে।

আভ্যন্তরীণ পর্যায়েঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের আংগিকে বাংলাদেশের স্থানীয় পরিস্থিতি নিয়ে আরও গবেষণার আয়োজন করতে হবে, এবং সেসব গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল ও আভ্যন্তরীণ নীতিমালার একটি সামগ্রীক পুনর্নিরীক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাকে অবাধ বাজার-মূলক নীতিমালার একটি নেতিবাচক ফলশ্রুতি হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং এই সমস্যা মোকাবেলায় অবাধ বাজারমূলক নীতিমালার উপর নির্ভর না করে একটি সমন্বিত সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সরকারকে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের তিনটি বড় বিপদ, তথা নিমজ্জন, বর্ধিত লবণাক্ততা, ও নদ-নদীর চরমভাবাপন্নতা, মোকাবেলার জন্য নদ-নদীর প্রতি ''অবরোধ পন্থা'' পরিত্যাগ করে ''উন্মুক্ত পন্থা'' গ্রহণ করতে হবে। বর্ষাকালের পানি ধরে রেখে তা শীতকালে ব্যবহারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে ও দেশের নদ-নদীর সারা বছরের নাব্যতা নিশ্চিত করতে হবে।।

জলবায়ু পরিবর্তনের আলোকে বাংলাদেশের কৃষি খাতের কি কি পুণর্বিন্যাস প্রয়োজন তা প্রয়োজনীয় গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করে বাস্তবায়িত করতে হবে। বিশষতঃ, এমন সব শস্য ও কৃষিপণ্য উতপাদনের উপর জোর দিতে হবে, যা লবণাক্ততা দ্বারা কিংবা অতিবণ্যা বা অতিখরা দ্বারা কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

দেশের জ্বালানী ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব অনবায়নযোগ্য জ্বালানীর বদলে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উপর জোর দিতে হবে। বিশেষতঃ, সৌরশক্তির প্রাচুর্য্যের প্রেক্ষিতে দেশে সৌরশক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে, এবং জ্বালানী চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সৌরশক্তি উতপাদনজনিত একটি নতুন শিল্পখাত বিকাশের উদ্যোগ নিতে হবে।

অনবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কম উদগীরণের লক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে ও অনবায়নযোগ্য জ্বালানী, বিশেষতঃ কয়লা উত্তোলনের ক্ষেত্রে দেশের পরিবেশ রক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সকল পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে তরুণ সম্প্রদায় ও আগামী প্রজন্ম এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক গ্যানলাভ করতে পারে এবং করণীয় সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের উপর গবেষণার উপর জোর দিতে হবে এবং সে লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক পৃথক বিভাগ অথবা গবেষণা ইউনিট খোলার উদ্যোগ নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ের উপর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সনের বাজেটে যে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন, তা ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হবে, এবং এই অর্থের উল্লেখযোগ্য অংশ দেশের ভেতর জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণায় ব্যবহার করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উপর যে প্রভাব পড়বে তার জন্য দেশকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের চিকিতসাবিদ্যা ও চিকিতসক ও নার্সদের প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচীতে জনস্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ ও জনসংখ্যার আকার হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হবে, ও জনসংখ্যা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পূর্বার্জিত সাফল্য-সঞ্জাত সকল প্রকার আত্মসন্তুষ্টি পরিত্যাগ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ ও জনসংখ্যার আকার হ্রাসের লক্ষ্যে পূর্ণোদ্দ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

বাংলাদেশের সকল নাগরিককে জনসংখ্যা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের প্রতি সহযোগীতা প্রদান করতে হবে, এবং সরকারী উদ্যোগের অপেক্ষা না করে স্বতঃ-প্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেন জলবায়ু বৈষম্যের (climate apartheid)-র উদ্ভব না ঘটে, সে ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে, এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের সামাজিক বিতরণের দিক থেকে একটি সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষেঃ

বাপা ও বেন আয়োজিত ২০০৯ সালের ২-রা জানুয়ারীর এই সম্মেলন আশা করে যে, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকী মোকাবেলার জন্য দেশের স্ববাসী ও প্রবাসী, বিশেষজ্ঞ ও কর্মী, সরকার ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ, রাজনীতিবিদ ও সাধারণ জনগণ, বিভিন্ন পেশার মানুষ, সংস্কৃতিসেবী, মিডিয়াকর্মী, তথা বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস রচনার যে উদ্যোগ সূচিত হলো, আগামীতে তা অব্যাহত থাকবে; ক্রমান্বয়ে আরও বেশী মানুষ, সংগঠন

ও প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগে শামিল হবেন এবং সকলের সমেবত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকী মোকাবেলার লক্ষ্যে জোরালোভাবে সামনে এগিয়ে যাবে।

একটি জাতির জীবনে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ইস্যু সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের ইস্যুই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সাহসের সাথে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সেই চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সাথে মোকাবেলা বরেছে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এই সম্মেলন আশা করে যে, বাংলাদেশের জনগণ আবারও ঐক্যবদ্ধভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সরকারকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। বেসরকারী সংস্থাসমূহকেও এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যু সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশের মিডিয়া, তথা সংবাদপত্র, টেলিভিশিন, ইত্যাদির বিশেষ ভূমিকা। এই সম্মেলন আশা করছে যে, সকলেই এই জাতীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজ নিজ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসবেন।

এই সম্মেলন আনন্দিত যে, বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)-র নেতৃত্বে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিশ্ববাসীর নিকট জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশের জন্য সৃষ্ট হুমকীর চিত্র তুলে ধরার কাজে ব্রতী হয়েছেন এবং সেই লক্ষ্যে বেশকিছু সাফল্যও অর্জন করেছেন। সম্মেলন আশা করে যে, আগামীতে প্রবাসীদের এই প্রয়াস আরও প্রসারিত ও বেগবান হবে এবং স্ববাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের যৌথ প্রচেষ্টা জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে বাংলাদেশের টিকে থাকার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সেই লক্ষ্যে ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে গবেষণা ও পর্যালোচনা উতসাহিত করার উদ্দেশ্যে বাপা ও বেন প্রতি বছরই জানুয়ারী মাসে জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যু নিয়ে এই সম্মেলনের মতো সম্মেলনের আয়োজন করার কথা চিন্তা করতে পারে।